আওয়ামী লীগ এবং রাজাকার তত্ত্ব

লিখেছেন **আলতাফ হোসেন**

রাজাকারের সংজ্ঞা কি? এর সঠিক কোনো সংজ্ঞা নেই। কেউ বলবেন স্বাধীনতাবিরোধী, কেউ বলবেন দেশদ্রোহী, কেউ বলবেন ঘাতক বা দালাল ইত্যাদি। উপরোক্ত শব্দগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই প্রত্যেকটি কাজই গণতন্ত্রের পরিপন্থী। রাজাকারের আভিধানিক অর্থ যাই হোক না কেন, ১৯৭১ সালে যে ব্যক্তিগুলো স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করেছিল, পাক হানাদারদের সাহায্য করেছিল, মা-বোনদের ইজ্জত লুটেছিল বা লুটতে সাহায্য করেছিল, নিরীহ জনগণের সম্পদ লুটপাট করে নিজের আখের গুছিয়েছিল, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করেছিল অর্থাৎ গণতন্ত্রের পরিপন্থী কাজ করেছিল তারাই রাজাকার, আলবদর ও আলশামস্ উপাধিতে ভূষিত। উপাধি বা নামকরণ সর্বজনীন। যদি কেউ ১৯৭১ সালে গণতন্ত্রের পরিপন্থী কাজ করার জন্য রাজাকার উপাধিতে ভূষিতে হতে পারে, তাহলে বর্তমানে যারা ব্যাংক ডাকাতি করেছে (অর্থাৎ যারা ব্যাংক থেকে কোটি কোটি টাকা ঋণ নেয় অথচ তাদের খেলাপি বলা হলে দেশের সর্বোচ্চ আর্থিক লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে ধমক দেয়), মিগ ও ফ্রিগেট কেনার নামে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে, দেশের আত্মসাৎকৃত টাকা দিয়ে লন্ডন ও নিউইয়র্কে বাড়ি বানিয়েছে (অনেকে ভোটের ফলাফল দেখে বর্তমানে সেই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে), শিক্ষা সন্ত্রাস করেছে (সময়মত বই সরবরাহ করেনি এবং পরে যা করেছে তা আবার ভুলে ভরা), শেয়ার বাজারের নাম দিয়ে জনগণের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে কয়েক লাখ পরিবারকে পথে বসিয়েছে, সন্ত্রাসীদের খুন করার লাইসেন্স দিয়েছে এবং বর্তমানে জনগণের স্বাধীন প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে, মিথ্যাচার করছে– এগুলো কি গণতন্ত্রের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে? নিশ্চয়ই না, বরং এগুলো গণতন্ত্রের চরম পরিপন্থী কাজ। তাহলে যারা এই কাজগুলো যারা করছে, স্বাধীন দেশে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে দেশকে অস্থিরতার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে, নিজের কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছৃঙ্খল কাজ করার জন্য প্রচ্ছন্ন ঈঙ্গিত দিচ্ছে, তাদের কি নামে অভিহিত করা যায়? নিশ্চয় দেশপ্রেমিক নয়? মৌলিক শব্দ কখনোই পরিবর্তিত হয় না, তবে তার পূর্বে বিশেষণ ব্যবহৃত হয়ে তাকে নতুনত্ব দিতে পারে। সেই অর্থে আমরা কি তাদেরকে নয়া আধুনিক বা নব্য রাজাকার নামে অভিহিত করতে পারি না? আজ আপনারা যাদের রাজাকার ও মৌলবাদী বলে আখ্যা দিয়ে দেশের জনগণকে শঙ্কিত করে তুলছেন, তাদের উত্থানের পেছনে কার অবদান বেশি? আপনাদেরই। নিজেরা বিভিন্ন জায়গায় বোমা ফাটিয়েছেন। তদন্ত শুরু হওয়ার পূর্বেই তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই বিবৃতি দিয়েছেন এ কাজ জামায়াত-শিবির ও তাদের প্রশ্রয়দাতাদের। অতঃপর নামকাওয়াস্তে লোক দেখানো তদন্ত এবং তদন্তের কাজ অদৃশ্য কারণে বন্ধ। প্রতিবার বোমা ফাটার সঙ্গে সঙ্গে জামায়াত-শিবিরকে হিরো বানিয়েছেন কিন্তু একবারও কি প্রমাণ করতে পেরেছেন তারা এ কাজে যুক্ত ছিল? ১৯৯৬ সালে তাদের সঙ্গে জোট বেঁধে কোলাকুলি করে এক মঞ্চে উঠে স্লোগান দিয়েছেন। তখন তারা রাজাকার ছিল না, ছিল মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি।

আপনাদের সরকারের আমলে সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব কৃষিপণ্যের বাম্পার ফলন। যে কথাটি বিভিন্ন সাক্ষাৎকার এবং নির্বাচনী প্রচারে সর্বাধিক আপনারা ব্যবহার করেছেন। আপনারা যারা বুদ্ধিজীবী নামে পরিচিত, তারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন এই যোগ্যতাটি অর্জন করতে কতটা শ্রম দিতে হয়েছে এবং সাধনা করতে হয়েছে। যদি তাই হয়, তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায়, কোনো প্রাপ্তি বিনা শ্রমে বা চেষ্টায় আসে না। এবার আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, আওয়ামী লীগ সরকার গত পাঁচ বছরে মিগ, ফ্রিগেট ও নিজেদের ব্যবহারের জন্য বিলাসবহুল কার ব্যতীত কৃষিকে আধুনিকীকরণের উপকরণ হিসেবে কোন অত্যাধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানি করে তা কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেছে? সেচ প্রকল্পকে আধুনিকীকরণ করে সেই প্রকল্পের কোন সুবিধা দিয়ে কোন কৃষককে উপকৃত করেছে? উত্তর, অবশ্যই করেনি। তবে হ্যাঁ, যা করেছে তা হলো সার বিতরণে অনিয়ম, বাম্পার ফলনের পরে উদ্বৃত্ত ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করা এবং কৃষকদের ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রদান না করা। তাহলে আওয়ামী লীগের কৃতিত্ব কোথায়? বিষয়টা তাহলে এমন দাঁড়াচ্ছে, আমি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আমার শিক্ষাজীবনের সর্বশেষ সনদপত্র অর্থাৎ মাস্টার ডিগ্রি সার্টিফিকেটটি পেলাম। এতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই, সম্পূর্ণটাই আওয়ামী লীগ সরকারের কৃতিত্ব। কেননা, আমার প্রাপ্তিটা ঘটেছে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। যেমনটি ঘটেছে যমুনা বহুমুখী সেতুর ক্ষেত্রে। এরশাদ সরকারের সময় শুরু হয় এবং বিএনপি সরকারের আমল পর্যন্ত আশি ভাগ কাজ সমাপ্ত হয়। বিএনপি সরকার কিন্তু তার নাম জিয়া ব্রিজ রাখেনি, নদীর নামেই তা রাখা হয়েছিল 'যমুনা বহুমুখী সেতু'। কিন্তু আপনাদের ছিনতাইকারী সরকার বাকি বিশ ভাগ কাজ করে প্রথমে 'বঙ্গবন্ধু যমুনা বহুমুখী সেতু' নামকরণ করে এবং তারপর আপনাদের বহুল ব্যবহৃত অস্ত্র প্রয়োগ করে সূক্ষ্ম কৌশলে যমুনা নামটি বাদ দিয়ে তার নাম রাখা হয় 'বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু'। বাস্তব কথা এই যে, আমাদের কৃষি এখনো প্রকৃতিনির্ভর। আমাদের দেশে এখনো ভারনালাইজেশন বা ফটোপিরিয়ডিজম পদ্ধতির ব্যবহার হয় না। আমরা এখনো আকাশের দিকে চেয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি বৃষ্টির জন্য। প্রকৃতি সদয় না হলে আওয়ামী লীগ বা বিএনপি কোনো সরকারেরই সাধ্য নেই বাম্পার ফলন ফলায়। বলতে হয়, এটা দরিদ্র জনগণের ওপর আল্লাহর অসীম কৃপা। দেশে যে দুর্নীতি চলেছে, আল্লাহ এই কৃপাটুকু না করলে জনগণ না খেয়ে মরতো।

'সন্ত্রাসকে লালন করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কে সন্ত্রাসী ও কে সন্ত্রাসী নয় তা একাকার করে ফেললেন। ফলে তাকে নতুন আইন তৈরি করতে হয় নিজের নিরাপত্তার জন্য। সারাক্ষণ সঙ্গে রাখেন এসএসএফ। যে জনগণকে বিগত পাঁচটি বছর সন্ত্রাসীর দ্বারা অতিষ্ঠ করে রেখেছিল আওয়ামী লীগ সরকার, ক্ষমতা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোল পাল্টে জনগণের কাছ ভোট ভিক্ষা চাইলো তাদের কাছে'

ভোটের ফলাফল এবং অসহযোগ আন্দোলন

ভোটের দিন ফলাফল ঘোষণা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সবাই একমত নির্বাচন সুষ্ঠুই হয়েছে। কিন্তু বিপত্তি ঘটলো ফলাফল ঘোষণা শুরু হওয়ার পর থেকে। আওয়ামী লীগ নেতা-নেত্রী ও তাদের বুদ্ধিজীবীদের সুষ্ঠু শব্দটি ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে 'স্থূল কারচুপি'তে রূপান্তরিত হয়ে গেল। গো ধরলেন গণতন্ত্রের মানসকন্যা। ডাক দিলেন অসহযোগ আন্দোলনের। মাননীয় বুদ্ধিজীবীদের কাছে আমার প্রশ্ন, স্বাধীন দেশে কার বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন? মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন করেছিলেন। কোনো স্বাধীন দেশের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন করা যায় না। স্বাধীন দেশে অসহযোগ আন্দোলন দেশদ্রোহিতারই শামিল। মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে কোনো নির্বাচিত সরকারকে নয়, তাড়িয়েছিলেন ব্রিটিশ বেনিয়াদের। স্বাধীন করেছিলেন ভারতবর্ষকে। স্বাধীনতার পর তিনি কিন্তু শত অনুরোধ সত্ত্বেও দেশের দায়িত্বভার নিতে রাজি হননি। তিনি জানতেন, আন্দোলন করা এবং দেশ শাসন করা এক বিষয় নয়। তাই তিনি জওহরলাল নেহরুর হাতে দেশ চালাবার ভার অর্পণ করেন। তার এই মহৎ কর্মের জন্যই আজ তিনি বিশাল ভারতের জাতির জনক। সরকার পক্ষ থেকে নির্দেশ দিতে হয় না যে প্রত্যেক স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালতে এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে তার ছবি চড়াতে হবে। এর জন্য কোনো আইন তৈরি করতে হয় না, ভারতের জনগণ স্বেচ্ছায় ও সশ্রদ্ধচিত্তে নিজ দায়িত্বেই তা করে।

ওয়াহিদুল হক বিচারপতি লতিফুর রহমানকে বলেছেন, 'নীতিজ্ঞানবর্জিত, অনুভূতি-উপলব্ধিহীন নব্বই দিনকা সুলতান।' প্রথমে আমাদের জানা দরকার একজন আওয়ামী লীগের তোষামোদকারী হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও সরকারপ্রধান লতিফুর রহমান সম্পর্কে এমন মন্তব্য করার অধিকার আপনার কতটুকু আছে। নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে, বিচারপতি লতিফুর রহমান কোনো সূক্ষ্ম বা স্থূল কারচুপির মাধ্যমে নব্বই দিনকা সুলতান হননি। আপনাদের বাক্যসন্ত্রাসী নেত্রী নিজের মুখেই সবসময় স্বীকার করেছেন এবং করেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণাটি তারই সৃষ্টি। আর সেই সৃষ্টিটি তিনি সাড়ে তিন বছর দেশকে অরাজকতার মধ্যে ফেলে সৃষ্টি করেছিলেন।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে দেয়া একটি প্রতিশ্রুতিও পালন না করে শেখ হাসিনা সরকারি প্রচার বাক্স বিটিভির ভাষণে জানান, তিনি দুই-একটি বাদে ইশতেহারে দেয়া সমস্ত ওয়াদা পালন করেছেন। অর্থমন্ত্রী শাহ্ এএমএস কিবরিয়া আবার তার এক ধাপ ওপরে। তার উত্তরগুলো পিচ্ছিল মাছের মতো। ধরুন আপনি কাউকে প্রশ্ন করলেন, তোমার নাম কি? উত্তরে সে জানালো, তার বাবার নাম অমুক, তার দাদার নাম অমুক, তার চাচার নাম অমুক, তার ভাইয়ের নাম অমুক। কিন্তু নিজের নাম কি তা জানালো না। তুমি কি কর? এর উত্তরেও সে তার বাবা, দাদা চাচা, ভাই কি করে তা জানালো কিন্তু সে কি করে তা জানালো না। নির্বাচনের পূর্বে ও পরে একুশে টিভি ও চ্যানেল আইকে দেয়া সাক্ষাৎকারগুলো দেখুন, তবেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। যখন জনগণের অর্থ আত্মসাতের জন্য শেয়ার বাজারকে চাঙা করা হলো, তখন তিনি বললেন, এটা আওয়ামী লীগ সরকারের কৃতিত্ব। যখন ধস নামা শুরু হলো তখন তিনি জানালেন ১,৫০০ সূচকের নিচে না নামলে তাকে পতন বলা যাবে না। যখন ১,৫০০ সূচকের নিচে নেমে গেল (বর্তমান ৭০০ সূচকেরও অনেক নিচে) তখন তিনি জানালেন, শেয়ার বাজার সম্পর্কে তিনি কিছু বোঝেন না। শুধু তাই নয়, যখন দেশের মন্দা অবস্থার ইঙ্গিত দিয়ে পত্রিকায় রিপোর্ট বের হলো, তিনি ঈদের বাজারে লোক সমাগমের কথা উল্লেখ করে বললেন, দেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হলে মার্কেটে এতো লোক কেনাকাটা করতে যায় কিভাবে? আওয়ামী লীগের ঐকমত্যের সরকারের যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ক্ষমতা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জানান, শাহ এএমএস কিবরিয়া দেশের অর্থনীতিকে ফুটো করে দিয়েছেন। নিজের দলের লোক যদি এ কথা বলতে পারে তাহলে পাঠকগণ বুঝতেই পারছেন প্রকৃত অবস্থা কি? এই ব্যক্তি ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে দিয়েছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে বৈদিশিক মুদ্রার রিজার্ভ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে এসেছেন। আর একজন জিল্লুর রহমানের কথা বলা যায়। তোষামোদকারীদের যদি ডিগ্রি দেয়ার রেওয়াজ থাকতো তাহলে জনাব জিল্লুর রহমান কয়েকটি ডক্টরেট ডিগ্রি হাসিল করতে পারতেন।

'স্বাধীন দেশে অসহযোগ আন্দোলন দেশদ্রোহিতারই শামিল। মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে কোনো নির্বাচিত সরকারকে নয়, তাড়িয়েছিলেন ব্রিটিশ বেনিয়াদের। স্বাধীন করেছিলেন ভারতবর্ষকে। স্বাধীনতার পর তিনি কিন্তু শত অনুরোধ সত্ত্বেও দেশের দায়িত্বভার নিতে রাজি হননি'

সাবেক মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। যিনি মাটি খুঁড়ে সন্ত্রাসী বের করে আনেন। তবে তার সঙ্গে আরেকটি কথা তিনি সংযোজন করেননি। মাটি খুঁড়ে যে সন্ত্রাসী তিনি বের করেন তা তার আস্তিনে স্থান পায়। আর সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত? তিনি তো স্বঘোষিত সন্ত্রাসীর জন্মদাতা। এতো গেলো মিথ্যাচারের কাহিনী। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তার দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দেন একটি লাশের বিপক্ষে দশটি লাশ ফেলে দেয়ার। লক্ষ্মীপুরের তাহেরকে তার সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে আরো উৎসাহিত হওয়ার জন্য তার সপক্ষে কথা বলেন ও সাংবাদিকদের বিষোদগার করেন। তিনি বলেন, জয়নাল হাজারীর মতো (সন্ত্রাসী) আরো কয়েকজন তার দলে থাকলে তাকে ভাবতে হতো না ভবিষ্যতে ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া নিয়ে। সন্ত্রাসকে লালন করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কে সন্ত্রাসী ও কে সন্ত্রাসী নয় তা একাকার করে ফেললেন। ফলে তাকে নতুন আইন তৈরি করতে হয় নিজের নিরাপত্তার জন্য। সারাক্ষণ সঙ্গে রাখেন এসএসএফ। যে জনগণকে বিগত পাঁচটি বছর সন্ত্রাসীর দ্বারা অতিষ্ঠ করে রেখেছিল আওয়ামী লীগ সরকার, ক্ষমতা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোল পাল্টে জনগণের কাছ ভোট ভিক্ষা চাইলো তাদের কাছে। সবচেয়ে পরিহাসের বিষয় এই যে জয়নাল হাজারী, শামীম ওসমান, হাজী সেলিম, আলহাজ মকবুল, ডা. ইকবাল, হাসনাত আব্দুল্লাহ, মায়া এদের মতো সন্ত্রাসীদের এবং সালমান এফ রহমান, আক্তারুজ্জামান বাবুর মতো ঋণখেলাপি ধুরন্ধর ব্যক্তিদের নমিনেশন দিয়ে তারা জনগণকে প্রতিশ্রুতি দেয় আবার ক্ষমতায় গেলে তারা সন্ত্রাস নির্মূল করবে। দেশ ও জাতির সঙ্গে তামাশা বা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয় (এ ব্যাপারে অবশ্য বিএনপিও কম যায়নি। তারা পিন্টু, ভিপি জয়নাল ও আমানুল্লাহ আমানের মতো সন্ত্রাসী ও বিলখেলাপিকে নমিনেশন দিয়েছে)। জনগণ জানে এক বেলার খাবার ভিক্ষা দেয়া যায় কিন্তু পাঁচ বছরের ভোট ভিক্ষা দেয়া যায় না। আর এই ভিক্ষা না দেয়ার ফলেই ভিক্ষুকের মাথা গেল বিগড়ে।